রোগটা আসলে কোথায়

দেশ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৭

অরুণাভ সেনগুপ্ত

বেলাভূমির ওপর একটা কাঠের বাংলো, দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন ডাঃ পল ক্লেনার। ঝোড়ো হাওয়া আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁর দিকে সটান এগিয়ে আসছেন এক বৃদ্ধ। পিছনে উত্তাল সমুদ্রের মতোই অশান্ত তাঁর মুখ-চোখ। ক'দিন আগে ডাঃ ক্লেনারের হাতে অস্ত্রোপচারের সময়মারা গেছেন বৃদ্ধের স্ত্রী।কৈফিয়ত দিতে উপকূল শহর রোদান্তেতে তাঁর সঙ্গেদেখা করতে এসেছেন ডাঃ ক্লেনার।দু'জনে মুখোমুখি।ডাঃ ক্লেনার বলছেন, কোনও অজানা কারণে প্রতি পঞ্চাশ হাজারেএকটি এরকম দুর্ঘটনা হতে পারে। বৃদ্ধ চুপ করে শোনেন কিছুক্ষণ, তারপর বলে ওঠেন, "তোমার কাছে পঞ্চাশ হাজারে একজন...একটা সংখ্যা...তেতাল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবন আমাদের...তুমি কি আমার স্ত্রীর চোখের তারার রংটা দেখার সময় পেয়েছিলেডাক্তার?"

'নাইটস ইন রোদান্তে'চলচ্চিত্রেরএইদৃশ্যটিতে নিখুঁত চিত্রায়িত প্রিয়জনএবং চিকিৎসকেরপারস্পরিক সম্পর্কের নানা ফাটল ওতীব্রঅনুভূতি, বৈজ্ঞানিকের নৈর্ব্যক্তিকতা,সংখ্যাতত্ত্ব-নির্ভর চিন্তাকাঠামো বনাম প্রিয়জনের মানবিক আচরণের দাবি।মৃত্যুর উপচ্ছায়ায় দাঁড়ানোদুই অনাত্মীয় পক্ষের মধ্যে এইসংসর্গের তীব্রতা সম্ভবত অন্য যে কোনও সামাজিক আদানপ্রদানে, দ্বন্দ্বে উৎসারিতঅনুভূতির তীব্রতার চাইতে বহুগুণে বেশি। সে তীব্রতার সামাল দিতে পারে একমাত্র বিশ্বাস ও সমবেদনায় জোড়া দুই পক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।একটা অবিশ্বাসের ঝোড়ো হাওয়ায়ইদানীং সে সম্পর্ক এতই বৈরি যে চিকিৎসকরা নিজেদের তুলনা করছেন জোসেফ হেলারের'ক্যাচ টোয়েন্টিটু' উপন্যাসে পিনাওসা সামরিক বিমানঘাঁটির বৈমানিকদেরসঙ্গে। সেখানে বৈমানিকদেরপাঠানো হয় এমন সব অভিযানে যেখানে মৃত্যু নিশ্চিত, তবুও সামরিক আইনের ২২ নং ফ্যাকড়ায় আটকে গিয়ে বৈমানিকরা বাধ্য হয় অভিযানে যেতে। তাদের এগোলেও

বিপদ, পেছলেও বিপদ। এরকম একটা উভয় সংকটে আটকে গেছেন চিকিৎসকরা। আধুনিক নির্দেশিকা ও ধারা মোতাবেক চললে অহেতুক ছানবিন, ফোঁড়াফুঁড়ি, পয়সা কামানোর অভিযোগ,না মানলে গাফিলতির। ঝুঁকি ছাড়া চিকিৎসা হয় না, আবার ঝুঁকি অসার্থক হলে অর্থদণ্ড,হাজতবাস, এমনকী ইদানীং গণ প্রহার। নানা ফরিয়াদে বারবার কাঠগড়ায় উঠে,আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকরা হতোদ্যম, চিকিৎসা ব্যবস্থাই বেহাল। অদ্ভুত আতান্তর, কিন্তু আপাত বিরোধী ঠেকলেও,পূর্বাপর এবং অনুবন্ধের বিচারে একেবারে ইতিহাসবিরুদ্ধ বা অপ্রত্যাশিত নয়।

যারা ঈশ্বরের অবহেলা বা পাপ করবে তারা চিকিৎসকের হাতে পড়ার মতো শাস্তি পাবে: যিশু

চিকিৎসকরা ঐতিহাসিক ভাবে সমাজে সমাদৃত ও সম্মানীয়, এই নিটোল ধারণায় কিন্তু অনেকটাই টোল পড়ে অতীত খুঁটিয়েদেখলে। সমাজের একটা অংশ, বিশেষ করে সমাজপতিরা, বরাবরই চিকিৎসকদের প্রতি নির্দয়।চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তিকালে সমাজের অবস্থান সাধারণভাবে কঠোর ছিল। ভারতবর্ষে চিকিৎসা পেশায় নিযুক্ত বৈদ্যকুলের পূর্বপুরুষ অম্বষ্ঠরা হিন্দু ধর্মের আইন প্রণেতামনু, যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ ঋষিদের বিচারে জল-চল ছিলেন না। চিকিৎসকদের বাড়ির সামনের ভিড়টা সব সভ্যতাতেই দলপতি-পুরোহিত গাঁটবন্ধনেরঅপছন্দ ছিল, এরপর খোদার উপর খোদকারিরমতো চিকিৎসকরা শল্য চিকিৎসা আরম্ভ করতেই আরোপ হল নানান বিধিনিষেধ, জারি হল ব্যাবিলনের শাসক হামুরাবির‘চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত’-এর মতো সোজাসাপটা অনুশাসন—শল্যচিকিৎসায় ভুলের শাস্তি চিকিৎসকের হাত কেটে নেওয়া। রুগি ক্রীতদাস হলে অবশ্য মালিককে একটা নতুন দাস দিলেই হবে।তবে জনগণেশের আরোগ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করা যেত না, তাই সমঝোতা হয়েছিল ভগবান চিকিৎসকের কল্পনায়। মিশরে ইমহোটেপ, আইসিস, গ্রিসে অ্যাসক্লেপিয়াস, ভারতে ধন্বন্তরি, কোথাও দেবতাকে আরোগ্যের অধীশ্বর হিসাবে কল্পনা করা হল, কোথাও চিকিৎসককে দেওয়া হল দেবতার আসন। চিকিৎসার জন্য এঁদের পীঠস্থানে ভিড় করত মানুষ।অলৌকিক নিরাময়ের ক্ষমতা প্রদর্শনহয়ে উঠল জনচিত্ত জয়ের অন্যতম শর্ত ।বাইবেলের দাবিমতো যিশু নিজেই ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ‘সর্বোত্তম’ চিকিৎসক। বুদ্ধও তাই। ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে রাজারাও। রাজস্পর্শে সুস্থ হতেন প্রজারা।এখনও ক্যাথলিক

পুরোহিতদের সন্ত হবার শর্ত অন্তত দু'টি অলৌকিক নিরাময়। এই অলৌকিক ব্যাপারটাই বিপত্তি বাধাল। চিকিৎসককে দেবত্ব আরোপ করে চিকিৎসার মানদণ্ডকে ঐশ্বরিক মাত্রায় বেঁধে দেওয়ায় এর নিচে অধিকাংশ সময়ে রোগ নিরাময়ে অসমর্থ সাধারণ চিকিৎসকরা স্বভাবতই হন্যমান হলেন। যিশুর নিজেরই উক্তি,'অসুস্থ হলে অবহেলা না করে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে। যারা ঈশ্বরের অবহেলা বা পাপ করবে তারা চিকিৎসকের হাতে পড়ার মতো শাস্তি পাবে।'প্রতিযোগী ঐশ্বরিক শক্তি হওয়ায় প্রথম থেকেই হেরে গেলেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসককে প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিলেন একমাত্র বুদ্ধ। গ্রিসে সাধারণ চিকিৎসকরা নিচু জাতের কারিগর হিসাবেই বিবেচিত হত।গর্বিত রোমানরা এ পেশার ঠিকা দিয়েছিলেন গ্রিক দাসদের। ধর্মীয় বাধায় শব ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকায় বহুদিন চিকিৎসাশাস্ত্রে বিজ্ঞানের থেকে অজ্ঞানতাই বেশি ছিল। গুটিকতক উচ্চমানের শিক্ষাদানকেন্দ্রে যেটুকু নেপথ্য জ্ঞান ছিল তার বিতরণ ছিল সীমিত।আয়ুর্বিজ্ঞানের চর্চা করা কিছু বিজ্ঞানসাধক প্রকৃতিবিদ, রাজপুরুষদের খাস চিকিৎসক, নীহাররঞ্জন রায় যাঁদের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব'-এ রাজার 'অন্তরঙ্গ' বলে অভিহিত করেছেন, ও প্রশাসন নিয়োজিত কিছু চিকিৎসক ছাড়া বাকিরা—শেক্সপিয়ারের ভাষায় 'ডিসগাইসড চিটারস, প্রাটিং মাউন্টেব্যাঙ্কস'– শহর থেকে শহরান্তরে নানা বাজারে তাঁদের পশরা বিক্রি করতেন। ১৮৯৬-এ উত্তর ভারতের এক জেলাশাসক উইলিয়াম ক্রুক 'বৈদ বৈদ' হাঁক পেড়েফেরিওয়ালাদের মতোই ফেরি করে বেড়ান 'মহাওত' নামে একদল বৈদ্যের কথা লিখছেন। সে সময়ে বেশির ভাগই শিক্ষাবিহীন হাতুড়ে,হঠাৎ-ডাক্তার, ভলতেয়ারের ভাষায়'যাদের ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান সামান্য, রোগ সম্বন্ধে আরও কম, রুগি সম্বন্ধে কিছুই না'। কিছু রোগ ভাল হত বিশ্রামেআর পথ্যে, কিছু শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতায়, আর কিছু রোগ স্বতঃই নিজগুণে সীমিত বলে।বাংলা সাময়িক পত্র*চিকিৎসক ও সমালোচক* ১৩০১ সনে লিখছে, 'এখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন২ লোক জমিদারি সেরেস্তার কার্য করিতেন অথবা পণ্ডিতি করিয়া আসিতেছেন; মধ্যে খেয়াল হইল নিদানশাস্ত্র পড়ি। তিনি নিদান শাস্ত্র কিছুদিন পড়িয়া বিশেষ একটি উপাধিযুক্ত শাইনবোর্ড লিখিয়া একজন সুচিকিৎসক হইয়া পড়িলেন।' বিখ্যাত কবিরাজ গণনাথ সেন ঠাট্টা করেছেন, কলিযুগে চিকিৎসক পাঁচ প্রকার, কামার, মালাকার, নাপিত, ধোপা, আর বৃদ্ধা রাঁড়। আদি কলকাতার অনেক সাহেব ডাক্তারও ওই দলের। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের ডাক্তারের খিদমদগাররা ঘাটে নেমে ডাক্তারি বুকনি

ছাড়তেন । ফিরিঙ্গি আর বাবুপাড়ায় দু'চারজনের পসার তো জমেই যেত। এসব স্বশিক্ষিত ডাক্তারদের উপায় ছিল বাগাড়ম্বর, অদ্ভুতুড়ে সব ব্যবস্থা, আর নিদান হাঁকা। সমাজদর্পণ হিসাবে সেকেলে সাহিত্যেও তাই দেবতা চিকিৎসকের গুণগান আর তার পরেই বাচাল, ভাঁড়, অর্থলোভী অপদার্থ চিকিৎসকদের নিয়ে কৌতুক। উদাহরণ ইউরোপে বোকাচ্চিওর ডেকামেরন, চসারের ক্যান্টারবেরিটেলস থেকে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য। ঘেঁটে দেখুন ক্ষেমেন্দ্রর দেশোপদেশ, কলাবিলাস, আনুমানিক ১০৩৭–১০৬৬র মধ্যবর্তী সময়ে লেখা নর্মমালা। একাদশ স্তকের আর এক আখ্যান সংকলন কথাসরিৎসাগর, বা সপ্তদশ শতাব্দির নীলকান্ত দীক্ষিত রচিত কলিবিড়ম্বনম থেকে এমন কি তুলনায় আধুনিক নানা রচনায়। দশম শতাব্দির শেষভাগে জাত কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র 'কলাবিলাসে'– লিখছেন র'শ্বেতাম্বরজৈন সাধুদেরমতোই সাদা কাপড় পরা চিকিৎসকরা সব প্রশ্নের উত্তরেই বলেন 'তাও হতে পারে। নীলকান্ত দীক্ষিতের কৌতুক: 'রোগীকেঅসুখেরব্যাপারে বাড়িয়ে বললে হতাশ হয়ে পালিয়ে যাবে, কমিয়ে বললে চিকিৎসাই করাবে না। উভয় ক্ষেত্রেইঅর্থহানি। এ যুগের সংস্কৃত রচনা শংকর রাজারমনের 'বৈদ্যোপহাসকালিকায়' আছে 'চিকিৎসক তাকালেই একশো টাকা,কথা বললে হাজার,ছুঁয়ে দেখলে লাখ, আর ওষুধ দিলে গোটা জীবনটাই। চতুর্দশ শতাব্দির কবি পেত্রার্কের চিঠি পোপ ষষ্ঠ ক্লিমেন্টকে, 'আপনার রোগশয্যা পাশে ডাক্তারদের উপস্থিতি আমাকে শঙ্কিত করছে, প্লিনির সাবধানবাণী মনে করুন, ডাক্তাররা মারতেই ওস্তাদ।' মলিয়েরের মতো নাট্যকারদের প্রধান উপজীব্যই ছিল ডাক্তারদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশা। ১৬৫৮ থেকে ১৬৭৩-র মধ্যে ঠকবাজ চালবাজ ডাক্তারদেরনিয়েপাঁচটি মঞ্চ সফল নাটক 'দি ইমাজিনারি ইনভ্যালিড', 'দি ফ্লাইং ডক্টর', 'ডন জুয়ান', 'ডক্টর কিউপিড', 'ডক্টর ইনস্পাইট অফ হিমসেলফ', লিখেছিলেন মলিয়ের। 'ইমাজিনারি ইনভ্যালিড' নাটকে কাল্পনিক অসুখে ভোগা আরগঁ-র ইচ্ছা ভাল ডাক্তার দেখানো। বেরালদে,তার ভাই, তাকে বোঝাচ্ছে, 'এ সব ডাক্তাররা কথায় আর কাজে একেবারেই আলাদা, কথা বললে মনে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে চালাক লোক, কাজের সময় দেখবে একেবারেই নির্বোধ।' 'ডক্টর ইনস্পাইট অফ হিমসেলফ' নাটকে স্গ্যানারেল বলে এক বুদ্ধিমান কাঠুরেকে চিকিৎসক সাজানো হয়েছে সরলবুদ্ধি জেরঁত-এর মেয়ে, বিয়েতে অনিচ্ছুক এবং বোবা সাজা লুসিন্দার চিকিৎসা করতে। ডাক্তার সাজা স্গ্যানারেল-এর সংলাপ, 'এ পেশাটা বেশ ভাল, যাই

করো পয়সা মিলবে। ভুল করলেও মরা রোগী সাক্ষী দিতে আসে না।'অজ্ঞতা ঢাকতে স্ক্যানারেল ল্যাটিন বলার ভান করে আরআবোলতাবোল আওড়ে যায়। 'লিভার বাঁ দিকে' আর 'হার্ট ডানদিকে'শুনেই যখন জেরঁত আপত্তি করে ওঠে, তখন তার সাফাই, 'হ্যাঁ, আগে ওরকম ছিল,এখন আমরা এরকম বলি।'গোটা ইউরোপে তো বটেই, কলকাতাতেও অনুবাদে অনুকরণে এ সব নাটক হইহই করে অভিনীত হয়েছে। তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল প্রহসন-নাটক 'ডাক্তারবাবু' (ভুবনমোহন সরকার, ১৮৭৪) , 'ঠেঙ্গা-পথিক ভুঁইফোড় ডাক্তার' (ভুবনমোহন সরকার ১৮৮৬), 'ডাক্তারবাবু' (ডাক্তার রাজকৃষ্ণ রায়, ১৮৮৯)। সাহেবিয়ানা দেখানো অর্থলোভী ডাক্তার বনাম স্বল্পশিক্ষিত সরল কবিরাজদের গল্প,যার রেশ বজায় ছিল পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট'অবধি। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টা আলগা করে ছুঁয়েছিলেন 'ডাকঘর' এ, প্রাচীন কবিরাজের নির্দেশে বন্ধ থাকা অমলের ঘরের দরজা জানালা রাজচিকিৎসক এসে খুলে দেন, কিন্তু তার বাইরে শেক্সপিয়ার–ডিকেন্স-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে চিকিৎসকরা সাধারণত গুরুত্বহীন পার্শ্বচরিত্র, ভলতেয়ার, রুশো, টলস্টয়ের লেখনীতেঠাট্টার পাত্র। বারনাড শ'র'ডক্টরস ডিলেমা' নাটকের মুখবন্ধের ছত্রে ছত্রে ডাক্তারদের ছল চাতুরি আর পয়সা রোজগারেরকথা— 'একশো টাকা পারিশ্রমিক নেয়া বড় ডাক্তার কখনও দশ টাকা পারিশ্রমিকের ডাক্তারের সঙ্গে একমত হবেন না, কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁর বাড়তি নব্বই টাকার দাবিটা জোলো হয়ে যায়।'

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি, ফরাসি বিপ্লব, মানবতাবাদ ও দেশাত্মবোধের প্রসার,যুদ্ধের প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যায় তরুণদের ডাক্তারি ও সামরিক শিক্ষা, উপনিবেশগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, আর মিশেল ফুকোর ব্যাখ্যায়, 'তত্ত্বকথা ছেড়ে রোগশয্যা পাশে হাতেকলমে কেজোশিক্ষার ব্যবস্থা' কালক্রমে পাল্টে দিল গড়পড়তা চিকিৎসকদের চেহারাটা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রামে গঞ্জেও দেখা গেল সৎ আদর্শবাদী কিন্তু রোগ সারাতে পারে এমন চিকিৎসক। কৌতুক ছেড়ে সমাজদর্পণ হিসাবে সাহিত্যও গম্ভীর হল। ১৮৭২-এ বেরল জর্জ এলিয়টের'মিডলমার্চ'। তাঁর চরিত্র টারশিয়াস লিডগেট বিশ্বসাহিত্যে, বিজ্ঞজনমতে, প্রথম সৎ আদর্শবাদী চিকিৎসক–নায়ক। লেখা হল'মাদাম বোভারি', 'অ্যান এনিমি অফ দি পিপল', 'ডঃ পাস্কাল', 'আরোস্মিথ', 'সিটাডেল', 'প্লেগ'। বাংলা সাহিত্যে এল 'দত্তা', 'পথের দাবী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'অগ্নি'। নায়করা সব দেশপ্রেমী আদর্শবাদী,মহান

পেশায় ব্রতী। চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের স্বর্ণযুগ। ১৯৮০-৯০থেকেইআবার মোটামুটিভাবে গোয়েন্দা গল্প ছাড়া সাহিত্যজগৎ থেকেচিকিৎসক-নায়ক পুনর্বার গায়েব। বদলে বিষয় হলচিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা সামাজিক সমস্যা, ইচ্ছামৃত্যু,এডস,সমকামিতা,দেহযন্ত্রেরপ্রতিস্থাপন, বিজ্ঞানী-চিকিৎসকেররহস্যজনক কাজ কারবার ও বেনিয়াগিরি।আগে ছিল কৌতুক, মার্ক টোয়েনীয় ল্যাং, 'ওই ডাক্তারটার দুটো না। তিনটে রুগি ছিল। আমি জানি, নিজেই তো অন্ত্যেষ্টিতে গেছিলাম!' অথবা 'যদিও ডাক্তাররা চিকিৎসা করেছিল, রক্তমোক্ষণ করেছিল, ওষুধ দিয়েছিল, তবু সে ভাল হয়ে উঠল' জাতীয় টলস্টয়ের মোলায়েম খোঁচা, এবার এল চিকিৎসকের দুর্বৃত্তপনার খতিয়ান। পেন্ডুলামের উল্টো দোলনে রোগী-ডাক্তারের ঘনিষ্ঠতা ফের গলে জল। রোগীদের অভিযোগ বে-লাগাম পয়সা লোটা, গাফিলতি, অহেতুক বা ভুল চিকিৎসা। ডাক্তারদের অভিযোগ পান থেকে চুন খসলেও আইনি হয়রানি,থানা পুলিশ,গণপিটুনি।

চুলকানি আর অ্যালারজির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একশত মুদ্রা:ইংলিশ প্রবাদ

অভিযোগটা হালে জোরালো হলেও চিকিৎসা বরাবরই এক অর্থকরী পেশা। মহাভারতেঅন্তিম শয্যায় ভীষ্মের চিকিৎসার্থে হাজির হয়েছেন নানা চিকিৎসক—ভীষ্ম তাঁদের চিকিৎসা নিচ্ছেন না, কিন্তু হাতে গুঁজে দিচ্ছেন প্রত্যেকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক। হিপক্রাটিসের উপদেশ আছে, কী করে পশার বাড়াতে হয় । কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রেরুগীর সামাজিক শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন পারিশ্রমিকের বিধান আছে। ব্যবস্থাটা সমাজস্বীকৃত। আসলঅভিযোগটা অতিরিক্ত লোভের, বৈদ্যোপহাসকালিকার উপহাস, 'ডাক্তার দেখার আগে অবধিই কেউ তার গোপনস্থান বা গোপনসঞ্চয় গোপন রাখতে পারে।' আগে যার উল্লেখ করেছি, সেই সাময়িক পত্র *চিকিৎসক ও সমালোচক* ১৩০১ সনেই লিখছে, 'বর্তমান সময়ের অধিকাংশ চিকিৎসক অর্থলোলুপ...যদি একটি গরীব রোগী দেখেন হয়তো, তাহার রোগের কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না, বর্তমান সময়ের দয়া তো এই।'

হালফিল চিকিৎসকের ব্যক্তিগত লোভের চাইতেঅনেক বড় বিষয় বাণিজ্যিকহাসপাতালগুলির সর্বাধুনিক চিকিৎসা দেবার উদগ্রবাসনা এবং প্রক্রিয়াটাকেআইনানুগ রাখতে আনুষঙ্গিক হাজারো পরীক্ষা, যার আর্থিক দায়ভার রোগীর। 'সো মাচ ফর দ্যাট' উপন্যাসে লাওনেল শ্রিভার

বলেছেন কেমন করে এক আমেরিকান হাসপাতালে দেড় বছরে কুড়ি লক্ষ ডলার, পরিবারের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, সময়আর শক্তি নিঃশেষ করে তার এক বন্ধুর মেসোথেলিওমার চিকিৎসা হয়েছিল, লাভ মাত্রই আরও তিনটিযন্ত্রণাকাতরমাস ।

কেন তিনি এভারেস্টে চড়তে চান প্রশ্নেরউত্তরে জর্জ ম্যালোরির উত্তর ছিল,'কারণ ওটা ওখানে আছে।' অতএব চড়তে হবে। বহুমূল্য ব্যবস্থাপত্রের সাফাই গাইতে গিয়ে ডাক্তাররা বলেন 'কারণ ওটা নির্দেশিকায় রয়েছে।'অতএব দিতে হবে। ঠিক, আধুনিক চিকিৎসার শর্তই বহু নজির এবং যাচাই করা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা মেনে চিকিৎসার পদ্ধতি ঠিক করা।অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির জন্য জবাবদিহি করতে হলেও ওটাই চিকিৎসকের আত্মরক্ষার উপায়। অষ্টাদশ শতাব্দিতেই অভিযুক্ত চিকিৎসকের প্রতি বহুবিদ বিজ্ঞানমনস্ক পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্টেরপ্রশ্ন ছিল, বিজ্ঞানসম্মত সবরকম উপায় নেওয়া হয়েছিল কিনা। তথাপি এবং তথাপি,লাওনেল স্রিভারের মতো লেখকদের প্রশ্ন, আরোগ্যবিদ্যার চর্চা তো শুধুমাত্র অন্ধ বিজ্ঞান নয়, তা একটাউৎকৃষ্ট কলাবিদ্যাও, সে বিদ্যার কী হল? চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি, তাঁর বিশিষ্টতা, রোগীর প্রতি সমবেদনা? বিজ্ঞান না রোগী, কার স্বার্থ আগে? এই রোগের চিকিৎসাই তো ইউরোপে অন্যভাবে হত, নির্দেশিকা মেনেই!

সম্পর্ক বিষিয়ে দিতে খরচার খোঁচাটা কম নয়,বিশেষত আমাদের দেশের মতো যেখানে সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেতে কড়ি ফেলে তেল মাখতে হয়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই ব্যয়সাধ্য, তদুপরি সে ব্যবস্থায় ডাক্তারিটা অনেকটাই আর ডাক্তারদের হাতে নেই, চলে গেছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে। বড় পুঁজি, বড় বিনিয়োগ, ওষুধ, বিমা, উপকরণের সুচারু বিপণন, সব মিলিয়ে বড়লাভের জটিল নকশা। সে জটিলতায় বিভ্রান্ত হবার পর নগদ মূল্যে সেবা কিনে স্বভাবতই খদ্দেররা তুল্যমূল্য সন্তোষ চান। ডাক্তারি পরিষেবা যেহেতু সর্বদা পরিমাপযোগ্য নয়, তাই ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ চলতেই থাকে। অভিযোগ ওঠে অনেক দামি পরীক্ষা ও ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পেছনে বিজ্ঞানের টান নয়, বাণিজ্যিকআগ্রহটাই জোরালো।

‘মানুষ মারার জন্য ডাক্তারদের আমাদের মতোসৈন্যাধ্যক্ষদের চাইতে ঢের বেশি জবাবদিহি করতে হবে পরলোকে’:নেপোলিয়ন

খরচার খোঁচাটা সংঘাতের একমাত্র কারণ নয়,সরকারি হাসপাতালের নিঃশুল্কসেবা ঘিরেও হরদম সংঘাত বাধছে। নালিশ ভুল চিকিৎসা ও গাফিলতিরও। মানুষ মাত্রই ভুল করে, কাজেই ডাক্তারির মতো কঠিন কাজে মাঝেমধ্যেভুল হবে এতে আর আশ্চর্য কী!অবিশ্বাস্য ঠেকলেও জন হপকিন্স থেকে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রের দাবি,চিকিৎসায় ‘ভুল’ অর্থাৎ ভুল চিকিৎসা না, প্রয়োগে ভুল, (যেমন ওষুধের মাত্রায় বা সময়ের গণ্ডগোল, পরীক্ষার অস্পষ্ট ফলে বিভ্রান্তি, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রের ব্যবহার বা অদক্ষ ব্যবহার, চিকিৎসাজনিত জটিলতার সময়ে ব্যবস্থা না নেওয়া) আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইউরোপে অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি ১০ জন ভর্তি রুগির মধ্যে একজন চিকিৎসার ভুলে কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতেসঠিক নথিভুক্তি, হাসপাতালে মৃত্যুর ময়না, তথ্য প্রকাশ ইত্যাদি অভ্যাস না থাকায় সঠিক সংখ্যা জানা যায় না, তবে আনুমানিক হিসাবে সংখ্যাটা বেশিই হবে। ভুলের কারণ অনেক, নানা পর্যায়ের— অপটু ডাক্তার নার্সদের কাঁচা কাজ বা গাফিলতি থেকে প্রশাসনিক হেলাফেলা, দুর্নীতি, যার জেরে অক্সিজেনের অভাবে এক রাত্রেই মারা যায় ৭০টি শিশু! ভুল হতে পারে অভিজ্ঞ যত্নশীল চিকিৎসকেরও। তার বড় কারণ, প্রতিটি রোগাক্রান্ত শরীর আপন বিশিষ্টতায় অনন্য, প্রায়শই শরীরবিজ্ঞানের জানা আইনগুলি মেনে চলেনা। এ ছাড়াও ওষুধেরঅপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া, মারাত্মক সংক্রমণ,শল্য চিকিৎসার জটিলতা ইত্যাদি হাজারো ঘটক আছে যারা চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। চিকিৎসকের লড়াইও যে একটা সময় শেষ হবে,পরিজনদের বাড়তি প্রত্যাশা সে সত্য মানতে চায় না।যত গণ্ডগোলের মূল ইন্ধন এই চাওয়া-পাওয়ার অমিল। আগে জাদুকররা চিকিৎসা করত, এখন লোকে চিকিৎসকের কাছে চায় জাদুকরের চমৎকার। তাদের কাছে অসফল চিকিৎসা মানেইভুল চিকিৎসা, গাফিলতি।আয়ুর্বিজ্ঞানটার যে নিজেরই খামতি আছে, এ বিজ্ঞানে চিকিৎসকের শত যত্ন সত্ত্বেও সর্বদা অঙ্ক কষে গোনাগুনতি ফল যে ফলে না,এ যুক্তিকে লোকে আমল দেয় না। অট্টহাস্য করে ওঠেন বারনাড শ’-ও, ‘অন্য মামলায় বিশেষজ্ঞ সাক্ষী সেজে বলো আমার বিজ্ঞান একদম নির্ভুল, তোমার সাক্ষ্যে

হাজার লোকের ফাঁসি হল। আর নিজে কাঠগড়ায় উঠলে বলো, আসলে আমাদের শাস্ত্রটাই কিছু গোলমেলে! 'শ' হাসলেও উচ্চতম ন্যায় আদালত বারবার নানা মামলায়এ যুক্তিকে মান্যতা দিয়েছেন।

অর্থলোভে নিয়ম ভাঙায় অ্যাসক্লেপিয়াসের মাথায় জিউসের বজ্রাঘাত

চিকিৎসা বিধিদত্ত দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব পালনে অপারগতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ব্যাপারে আসিরীয়, মিশরীয়, গ্রিক, ভারতীয় সব প্রাচীন শাস্ত্রই একমত। অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে অর্থলোভে মৃতকে জীবনদানের চেষ্টা করায় গ্রিক আরোগ্য-দেবতা অ্যাসক্লেপিয়াস নিজেই জিউসের বজ্রাঘাত এড়াতে পারেননি। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী চিকিৎসা শুরুর আগে রাজা অথবা গোপ বা স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক, এবং ভুল চিকিৎসার শাস্তির মাত্রা ঠিক করবে রুগির সামাজিক প্রতিষ্ঠা— সে রাজপুরুষ,রাজামানুষ, উত্তমমানুষ, বা মধ্যমমানুষ, এর মধ্যে কোনটি। অধম মানুষ যেমন ব্যাধ, পাখিমারা, দণ্ডিত বা দাগী অপরাধীদের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল রাজার অনুমতি বিনা চিকিৎসা, প্রচলিত পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতি বা গাফিলতি, অনধিকারী বা অদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা চিকিৎসা বা অন্যায্য মূল্য গ্রহণ। ওই সমস্ত বুনিয়াদি আইন ও চিকিৎসকের ধর্মনীতির যে-গড়ন হিপোক্রাটিস, সুশ্রুত, চরকের মতো শিক্ষকরা পুথি-ভুক্ত করে গেছেন, তার সঙ্গে আধুনিক আইনের মূল মতগুলির কোনও মৌলিক তফাত নেই। যথা,অসফল চিকিৎসা মানেই গাফিলতি বা ভুল নয়,রোগ নির্ধারণে বা চিকিৎসায় ভুল মাত্রই শাস্তিযোগ্য নয়। শর্ত: ভুলটা কৈফিয়তযোগ্য হবে, চিকিৎসকের যথোপযুক্ত দক্ষতা আর জ্ঞান থাকবে, আর তিনি প্রচলিত মানদণ্ডে স্বীকৃত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করবেন। তবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বলে মানদণ্ডটিবাঁধা থাকবে অনেক উঁচু মাত্রায়।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় যথেচ্ছাচার রুখতে আমাদের রাষ্ট্রে আছে দু'ধরনের ব্যবস্থা। এক, রাষ্ট্র নির্ধারিত সাংবিধানিক আইন, যার ভিত্তি ব্রিটিশ কমন ল। এবং দুই,চিকিৎসকদের নিজেদের খবরদারির ব্যবস্থা,যার সূচনা হয়েছিল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দিতে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির

চিকিৎসাবিদ্যার পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সূচনায় এবং পরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ভারতেস্বীকৃতি-দান ও প্রয়োজনে তা বাতিলের অধিকার মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার মতো নিয়ামক সংস্থার হাতে,যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ ঠুঁটো জগন্নাথ থাকার আর এখন তো দুর্নীতির দায়ে পরিচালন পর্ষৎটাই বাতিল হয়ে মাথায় সরকার আর আদালতের নজরদার নিয়ে বিলুপ্তির অপেক্ষায় এক নতুন পর্ষৎ। আইনি বিচার করে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত। দেওয়ানি মামলায় দোষ প্রমাণের দায় অভিযোগকারীর। কঠিন, ব্যয়সাধ্য লম্বা লড়াই।অস্ত্রোপচারেরগণ্ডগোলে পঙ্গু জাতীয় ক্রীড়াবিদ চন্দ্রশেখরকে একুশ বছর আদালতে কাটাতে হয়েছিল ক্ষতিপূরণ পেতে। উল্টোদিকে মহারাষ্ট্রের এক মহিলা চিকিৎসক আদালতে বাইশ বছর লড়াই করে দায়মুক্ত হলেন। এ বাইশ বছরে তাঁর পেশাদারি জীবন শেষ, কোনও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। ফৌজদারি আইনে চিকিৎসককে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করার বিধান আছে, বড় গহ্বর হল দোষ প্রমাণের আগেই শুধু প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দোষ চিকিৎসককেও গ্রেপ্তার ও হাজতবাস করানো।এ ছাড়াও আছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত আর হালে বেসরকারি হাসপাতাল আর ডাক্তারদের চটজলদি দণ্ড দেবার জন্য যোগ হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৭। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা নিয়ে সরকার মনোনীত এক আয়োগ নিজেই অভিযোগের তদন্ত করবে।চিকিৎসকদের একাংশের মতে এটি একটি অসাংবিধানিক চোখ রাঙানি। বেসরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তৈরি হলেও আশঙ্কা,এর মূল স্বরটি চিকিৎসকবিরোধী, ফলে গ্রামে গ্রামে এক ভুল বার্তা রটে যাবে ক্রমে।

আমি মারা গেলে ডাক্তারদুটোর গলা কেটে দিও-বুবগুইডিয়াসের রানী অস্ট্রাগিল্ড , রাজা গুস্টামকে

আইনের তোয়াক্কা না করে সরাসরি হাতে মারারএকটা প্রবণতা সর্বকালে সর্বদেশে ছিল। এক সময়ে রাজা-বাদশাহদের চিকিৎসায় ব্যর্থ চিকিৎসকের ভবিতব্য ছিল প্রাণত্যাগ নয় দেশত্যাগ। বন্দুক তলোয়ারের ডগায় বিবাদ মেটাতে অভ্যস্ত পশ্চিমাদের কাছে সহজলভ্য ছিল নিজের হাতের অস্ত্রটা। ১৮০৯-এ কেন্টাকিতে ডাঃ এফ্রায়াম ম্যাকডোয়েলযখন বিশ্বে প্রথম পেট কেটে মিসেস ক্রফোরডের ডিম্বাশয়ের টিউমার বার করছিলেন তখন বাইরে অপেক্ষা করছিল

‘লিঞ্চিং মব’। অসফল হলে ম্যাকডোয়েলকে সামনের গাছটাতেই ঝুলিয়ে দিত তারা। বর্তমানে আইনি শৃঙ্খলা আর সামাজিক বিন্যাসের জন্য ওদেশে আক্রমণকারীরা সাধারণত একাকী, আচম্বিত বিয়োগব্যথায় ভারসাম্য হারান নিকটজন অথবা মানসিক অবসাদগ্রস্ত,নেশাখোর, ডোল-প্রাপক, বা উৎকেন্দ্রিক ধর্মগোঁড়া কিছু লোক যারা ভ্রুণমোচনকারী চিকিৎসকদের গুলি করে। চিনদেশে পরিজনরা ‘ঈ নাও’ নামে গুণ্ডার দলকেডাক্তার পেটানোর বরাত দেয়। তত্রাচ আমাদের এখানে ঘটনাগুলি ব্যাপকতায় এবং চরিত্রে এতই অদ্ভুত যে আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকাতেও তা উদ্বিগ্ন আলোচনার বিষয়। হাসপাতালে-হাসপাতালে অনাত্মীয় উটকো লোকের দল হামলা করছে, হামলা হচ্ছে ছাত্র চিকিৎসকদের উপর, পরিবার সহ বর্ষীয়ান চিকিৎসকের বাড়িতে, মহিলা সেবাকর্মীদের উপর। সুরক্ষাবিহীন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের হেনস্থা প্রায় স্বীকৃত অধিকার।রাজনীতির দাদারা তাঁদের চড় থাপ্পড় মারার অভ্যাসটা আই সি সি ইউতেও ছাড়তে চান না। প্রশাসন নির্বিকার, যেন আদর্শ রাষ্ট্র থেকে চিকিৎসকরা নির্বাসিত। বিশেষ আইন (**West Bengal Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions Act, 2009)** থাকা সত্ত্বেও কোনও ঘটনাতেই হামলাকারীদের শাস্তি না হওয়াতে তারা ক্রমশই দুর্বার হচ্ছে, গায়ে মাথায় বিষ্ঠা মাখিয়ে দেবার ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটছে। মুখ ফিরিয়ে থাকার ভান করলেও সরকারি চিকিৎসকেরগায়ে লাগানো এ বিষ্ঠা অবশ্যই লেগেছে সরকারের মুখেও। ঘটনার মধ্যেও অবশ্য ঘটনা থাকে। ময়না করলে দেখা যায় কিছু ঘটনার পিছনে আছে স্থানীয় রাজনীতি, ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা।গণমাধ্যমের দায়িত্ব ব্যাপারগুলোকে খোলসা করা। অকুস্থল থেকে হাতুড়ে চিকিৎসকের মতই সৎ সাংবাদিকতার শিক্ষাবিহীন হাতুড়ে সংবাদদাতাদেরপাঠানো চটজলদি প্রতিবেদন প্রায়শই যথাযথ হয় না। ‘সদ্য-প্রাপ্ত’বেভুল খবরগুলিউত্তেজনাইবাড়ায়।

মন্দিরে ‘এত রক্ত কেন’ এটাও তো একটা বড় প্রশ্ন! অথচ ‘৭০- ’৮০র সেই সব রক্তাক্ত দিনে, হাসপাতালে বোমা বন্দুক হাতে যুযুধান নানা পক্ষের ঘেরাটোপে দাঁড়িয়েও, আমরা চিকিৎসকরা নির্ভয়ে কাজ করেছি। মাঝে মধ্যে আবেগের বিস্ফোরণ হলেও উদ্বেলতার মূল সুরটি ছিল, ‘ডাক্তারবাবু, বাঁচান’।বর্তমান অমিতচারিতা তো ব্যাধিগ্রস্ত পশ্চাদগামী সমাজের লক্ষণ! যাবতীয় আইনশৃঙ্খলা সদাচার ভব্যতাকে তুড়ি মেরে তালিবানি বর্বরতায় লিপ্ত হবার এই প্রবণতা কি খালি চিকিৎসক-রোগীর পালটে যাওয়া সম্পর্কের একমাত্রিকতায় আবদ্ধ? না

কি এ সমস্ত ঘটনা আরও কোনও গভীর বহুমাত্রিক সামাজিক অসুখের লক্ষণ? এটা কে মুষ্টিমেয় হিংসাশ্রয়ী লোকেদের বাড়বাড়ন্ত বলে ধরব, নাকি তা সমাজের অভ্যন্তরেই হিংসার ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ! ব্যাপারটা রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বস্তরেই অসূয়া, অসহিষ্ণুতায় বিদ্ধ অস্থিরসমাজের পরিচয় কিনা তা তাত্ত্বিকরা বিচার করবেন।কে জানে এ সব ঘটনাতেই হয়ত শোনা যাচ্ছে শিবাধ্বনি, অমাবস্যার গান। প্রশ্ন, বৃহত্তর সমাজ তা শুনতে পাচ্ছেন কিনা।

সমাজবিরোধী সর্বপ্রকার কায়েমি স্বার্থের মধ্যে রুগ্ন স্বাস্থ্যে কায়েমি স্বার্থ হচ্ছে নিকৃষ্টতম – বারনাড শ।

প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক, কারণ এই এক সংঘাতের ঘূর্ণিতে ডুবে যাচ্ছে স্বাস্থ্যের অধিকার ,রাষ্ট্রের দায়িত্ব,ও স্বাস্থ্য পরিষেবার রূপ নিয়ে অন্যান্য জরুরি আলোচনা। চিকিৎসক ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে এ লেখায় বিস্তারিত হবার পরিসর নেই তবে গোলমালের মূল উৎস রাজনৈতিক নেতৃত্বের পিছলে যাওয়ার কথাটা বলতেই হয়। ১৯৭৮ এ কাজাকাস্থানের আলমা আটায় ১৩৪ টি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ ঘোষণা করেছিল ‘স্বাস্থ্য এক মৌলিক অধিকার’। ‘২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য’ স্লোগান দিয়ে অঙ্গীকার করেছিল তার নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেবার— ৪০ বছর পরেও সে অঙ্গীকার রক্ষার ভাবনা আজকের নির্বাচনি হিসাব কষতে ব্যস্ত নেতাদের আশু কর্তব্যের তালিকায় নেই। যোজনা আয়োগের এক দিশা নির্দেশিকায় আদর্শ ব্যবস্থার চারটি নির্ণায়ক চিহ্নিত করা হয়েছে— প্রত্যেক নাগরিকের পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ; খরচের ন্যায্য সমবন্টন; দক্ষ, দায়িত্বশীল, সহমর্মী পরিসেবকের যথেষ্ট জোগান; মহিলা,শিশু ও অক্ষমদের বিশেষ ব্যবস্থা। কোনওটাই হয়নি। না হওয়ার কারণ ‘রাজনৈতিক অনীহা’: ‘Indeed the lacklustre progress of MNP(*Minimum Needs Programme*) over the Plans shows political disinterest and the only way for politics to become more salient to the health ofthe poor and the reduction of health inequalities is for a much greater transfer of public resources for provision and financing ...’ (Health Care in India - Vision 2020 Issues and Prospects, R. Srinivisan শ্রীনিবাসন ছিলেন কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেক্রেটারি)।

ওইটাই মোদ্দা কথা। যেখানে গোটা ইউরোপ সহ বেশির ভাগ সভ্যদেশে ৯০ শতাংশ নাগরিক নানাভাবে সরকারি আনুকূল্যে সর্বোত্তম চিকিৎসা পান,জাপান, ইজরায়েল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, কিউবা ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব একশো ভাগ, ব্রাজিল, কাতার,

আলজেরিয়া, ঘানা, ইজিপ্ট, তাইল্যান্ড সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রচালিত সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা জারি, বেসরকারি ব্যবস্থার মক্কা আমেরিকাতেও সরকারের যোগদান ৬৫ শতাংশ, সেখানে স্বাস্থ্যে ভারতে সরকারি নিবেশ জি ডি পি-র ১.১৫ শতাংশ আর বেসরকারি নিবেশ ৪% (তুলনায় সরকারি নিবেশ আমেরিকায় ৮.৩%; ইউরো অঞ্চলে ৮% ; ল্যাটিন আমেরিকায় ৩.৭%; সাব সাহারান আফ্রিকায় ২.৩%; বিশ্বের গড় ৬%। এটা ২০১৪র হিসেব, বিশ্বব্যাংক-এর দেওয়া পরিসংখ্যান)। ৭০-৮০ শতাংশ ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত কায়েমি স্বার্থের হাতে ছেড়ে দিলে কিছু বিষম ফল তো ফলবেই। বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠান নিশ্চয় বিশ্বমানের পরিষেবা দেয় কিন্তু তা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দু' পাশে অন্তহীন অন্ধকার প্রান্তরের মাঝে চলন্ত রেলগাড়ির কয়েকটি আলো-জ্বলা কামরা। তাতে চিকিৎসায় বৈষম্য দূর হয়না— যে বৈষম্য, মারটিন লুথার কিং-এর কথায়, 'নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অবিচার।'খামতি ঢাকতে সরকার পরিষেবা ছেড়ে শুধুই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিচ্ছে। এ রাজ্যের সাম্প্রতিক আইনটি একটা উদাহরণ। চিকিৎসা মূলত একটা সেবা, বাণিজ্য নয়—এরকম একটা অবস্থান থেকে তৈরি এই আইনের উদ্দেশ্য দোষীদের দণ্ডদানের মাধ্যমে রোগীদের সুচিকিৎসা সুনিশ্চিত করা। উদ্দেশ্য সৎ, আশংকা বাস্তব মাটিতে উল্টো ফলের। আগাছা নিড়াতে গিয়ে গ্রামে গঞ্জে সরকারি ব্যবস্থার খামতি পূরণ করে জরুরি পরিষেবা দেওয়া ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি মুড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। বলা হয়েছে ছোট-বড় সব বেসরকারি হাসপাতালকে আদায়ের অপেক্ষা না করে জরুরি চিকিৎসা জারি রাখতে হবে, কিন্তু বলা নেই কী উপায়ে তারা পাওনা অর্থ উশুল করবে। সরকার কোনও দায়িত্ব নেবে কিনা। বেসরকারি ক্ষেত্রে এমন বাধ্যতামূলক পরিষেবা দেবার আইন আছে আমেরিকায় আর চিনে, উভয় দেশেই সরকার নানা ধরনের তহবিলের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে ব্যবস্থাটা চালু রাখে। এই আইনে সেরকম কোনও ইঙ্গিত নেই।স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্য সরকারের নিজস্ব যোগদান অর্থের অঙ্কে বার্ষিক ৩৫০০ কোটি টাকা মাত্র, যেখানে বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির এক-একটির বার্ষিক লেনদেন ৫০০০ কোটির আশপাশে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ২০১৭-য় ঘোষণা করা হয়েছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দ ২০২৫ নাগাদ বাড়িয়ে জি ডি পির ২.৫% করা হবে, কিন্তু কী ভাবে সেটা ঘটবে এ ব্যাপারে তারা নিশ্চুপ। আর্থিক সংস্থানের ব্যাপারটা পুরো ধোঁয়াটে। সরকার বলে এক, করে এক। তহবিলে টানের অজুহাতে অর্থ দপ্তর প্রতিশ্রুত বরাদ্দ অক্লেশে অন্যত্র চালান করে, সাম্প্রতিক

উদাহরণ, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের প্রয়োজনের কুড়ি ভাগ ছাঁটাই। অন্যান্য কিছু দেশে যেমন আছে, সেরকম রাষ্ট্র পরিচালিত বা ভরতুকি দেওয়া নানা বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমে সব নাগরিকদের সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আনার কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। উল্টে, জোর পড়েছে প্রাথমিক পরিষেবাতেও বেসরকারি নিবেশ আর সরকার-ব্যবসায়ী যৌথ উদ্যোগের উপর। আপাতত বেসরকারি উদ্যোগের বাণিজ্যিক স্বার্থ, সরকারি ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও অদক্ষতা,রাজনৈতিক চাতুরির ধুলোয় ধূসরিত ডামাডোলের হাটে গরুচোর ধরা পড়েছেন চিকিৎসকরা।

একমাত্র নিজের পাড়ার বা চেনা লোক না হলে, প্রহার বা লাঞ্ছনা এড়াতে গুরুতর পীড়িতদের চিকিৎসা না করাই শ্রেয় -হিপক্রাটিস

চার হাজার বছর পরে আবার উপরের ক্ষুণ্নচিত্ত উক্তিটি ফিরে 'উশ্চারণ' করতে হচ্ছে। বৃত্তাকার পথে পৃথিবী ফিরছে হামুরাবির র পুরাণ–বিন্দুতে। ' চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত'। চিকিৎসা করতেই ভয় পাচ্ছেন চিকিৎসকরা। শুরু হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন পাঠ 'আত্মরক্ষামূলক চিকিৎসা', পিঠ বাঁচাতে আগে থেকেই প্রয়োজনাধিক ব্যয়বহুল বিস্তারিত ব্যবস্থা। চিকিৎসক-রোগীর খোলামনে আলোচনার চাইতে বেশি জরুরি উকিলি বুদ্ধিতে লেখা সম্মতিপত্র। এটা সত্যি,গলায় স্টেথোস্কোপ, হাতে কালো ব্যাগ, রাত-বিরেতে কাছে পাওয়া পিতাসুলভ মানুষটির সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়েছে গত শতাব্দির রোগী-ডাক্তারের বিশ্বাস ও সমবেদনায় যুক্ত আত্মিক অন্বয়।রোগীর চোখের রং না দেখা, নির্দেশিকা আর প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া মানবিক মুখ লুকানো চিকিৎসক এবং চিকিৎসার ফল নিক্তির ওজনে মেপে নিতে উদগ্রীব বর্তমান একদেশদর্শী সমাজের মধ্যে সেই পুরনো চুক্তিটির রেশ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। পরিবর্তিত সমাজেএর নব রূপায়ণ অপ্রত্যাশিত নয়, অবশ্যম্ভাবী। চিকিৎসকই কর্তা, এই কাঠামোর বদলে চিকিৎসক রোগীর সমান অংশীদারত্ব। কিন্তু সে উদ্যোগে কেমন করে কার্যকর অংশীদার হয়ে উঠবে সেই চিকিৎসক,আতঙ্কে যার সদিচ্ছাতেই টান পড়েছে! সেই সদিচ্ছা (গুড উইল), যাকে কান্ট বলেছেন জগতে একমাত্র অবিমিশ্র 'ভাল' আর সঠিক কর্তব্য স্থির করতে চিকিৎসকের প্রধান সহায়। উচ্চতম আদালতই বলেছেন শাস্তি বা প্রহারের ভয়ে কাঁপা হাতে ছুরি ধরা যায় না। ভয়ের আবহাওয়া বহু ক্ষেত্রেই চিকিৎসাবিজ্ঞানকে

পিছিয়ে দিয়েছে। শাস্তির ভয়ে অনেক সভ্যতায় শল্যচিকিৎসা অগ্রসর হয়নি।নানা বিধিনিষেধ ও ধর্মীয় অনুশাসন আয়ুর্বেদকে শব ব্যবচ্ছেদ করতে না দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছে পাশ্চাত্য আয়ুর্বিজ্ঞানের কাছে। ভাবতে হবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সাম দান সবছেড়ে শুধু 'দণ্ড' দিলে আমরাআসলে পিছন দিকে হাঁটব কিনা।